

Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ক্লোদ মনে

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kabir Chowdhury
Published online	June 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.1
Pages	1-18
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ক্লোদ মনে

কবীর চৌধুরী

ফরাসী ইমপ্রেশানিস্ট শিল্পীকুলের মধ্যে ক্লোদ মনের অবস্থান কেন্দ্রীয়। রূপবাদ বা ইমপ্রেশানিজম তার উজ্জ্বল বর্ণবিভার বৈচিত্র্য নিয়ে মনের চিত্রকর্মে সগৌরবে উপস্থিত। রুশ শিল্পকলাবিদ নীনা কালিটিনার ভাষায়: "গোটা ইমপ্রেশানিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মনের শিল্পকর্ম।[১] শিল্পী নিজে বলেছেন, "আমি সব সময়ই একজন ইমপ্রেশানিস্ট, এবং আমি তাই হতে চাই সর্বদা।"[২] মার্কিন চিত্র-কলাবিদ ডায়ানা কেলভারও তাঁর রুশ সতীর্থের মতো বলেছেন, Claude Monet was the Purest—indeed the quintessential Impressionist".[৩]

খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যকে বন্ধনমুক্ত আলো-হাওয়ার পরিবেশে, বিশেষভাবে সূর্যালোকের চঞ্চল দ্যুতিময়তার মধ্যে, মনে আশ্চর্য সজীবতার সঙ্গে তাঁর অজস্র ক্যানভাসে তুলে এনেছেন। রদ্যাঁর উক্তি মনে পড়ে— "..... গ্রামাঞ্চলে, সমুদ্রতীরে, সুদূর দিগন্ত, কম্পমান পত্র-পল্লবগুচ্ছ আর তরঙ্গমালার নিরন্তর ফিসফিসানির সামনে দাঁড়িয়ে: 'আঃ, কি অপরূপ এইসব—এই হল মনে।"[৪]

প্যারিসে ১৮৪০ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে ক্লোদ-অস্কার মনে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর শৈশব-কৈশোরের সব স্মৃতি জড়িয়ে আছে ল্য হাভর্-কে ঘিরে। ১৮৪৫ সালের দিকে মনে পরিবার প্যারিস থেকে ওই শহরে চলে গিয়ে সেখানে বাসা বেঁধেছিলেন। ল্য হাভর্-এর পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ড শিল্পচর্চার পক্ষে খুব অনুকূল ছিলো না। তদুপরি মনের ব্যবসায়ী পিতা পুত্রের চিত্রশিল্পী হবার ইচ্ছাকে তেমন আমল দিলেন না। ওই ছোট শহরটিতে চিত্রকলার কোন স্কুল ছিলো

না, কোন চিত্রপ্রদর্শনী হত না সেখানে, মিউজিয়ামে উল্লেখযোগ্য কোন সংগ্রহও ছিলো না। সাবলীল প্রতিভার অধিকারী বালক মনেকে তার এক আত্মীয়ার পরামর্শেই তুষ্ট থাকতে হত, তিনি শুধু নিজের আনন্দের জন্য ছবি আঁকতেন; আর অবশ্যই ছিলো তাঁর বিদ্যালয়ের ড্রয়িং শিক্ষক।

প্রথম দিকে তরুণ মনে ক্যারিকেচার অঙ্কনের মাধ্যমে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন। নরম্যান্ডিতে এই সময় নিজের এলাকার চিত্রশিল্পী বুদ্যাঁর সঙ্গে মনের পরিচয় ঘটে। বুদ্যাঁ-ই তাকে ক্যারিকেচার থেকে সপে এসে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলেন আকাশ, সমুদ্র, মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা ও দালান কোঠা। তিনি তাকে এসব লক্ষ্য করতে বলেন খোলা হাওয়ায়, বাধামুক্ত আলোর পরিবেশে। এই ভাবে দেখলে যে-জিনিস পাওয়া যায়, স্টুডিওর মধ্যে মডেলের সাহায্যে তা কখননোই লভ্য নয়। উন্মুক্ত পরিবেশেই সামগ্রিকতার আস্বাদন সম্ভব, নইলে চোখে পড়বে শুধু খণ্ডিত রূপ। মনে এ উপদেশ কখনো ভোলেন নি। তার স্বভাবজ প্রবণতাও ছিলো ওই দিকে।

এরপর প্যারিসে এবং তারপর আবার নরম্যান্ডিতে মনের শৈল্পিক বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। প্যারিসে ল্যুভর যাদুঘরে ধ্রুপদী চিত্রগুলি তিনি মন দিয়ে দেখলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তা থেকে শিখলেনও অনেক কিছু। কিন্তু বিশেষ ভাবে সমকালীন চিত্রকলার ধারা, তাঁর কালের চিত্রশিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনী, সমকালীন জীবন এবং তাঁর চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য—এসব তাকে আকর্ষণ করলো গভীরভাবে। কারো, রুশো, মিল্যে, কুরব্যে প্রমুখের ছবি তাঁর কাছে খুব ভালো লাগলো। বুদাঁ, জনকিঁ ও কুরব্যের ল্যান্ডস্কেপ-চিত্রাবলীর প্রাণবন্ততা দ্বারা মনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন।

১৮৬২ সালে মনে শার্ল গ্লয়রের স্টুডিওতে যোগ দেন। এখানে তিনি শিল্পীর পেশাদারী কলাকৌশল সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, কিন্তু এর চাইতেও যা মূল্যবান তা এই যে ওই স্টুডিওতেই মনের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে বাজিল, রেনোয়া ও সিসলের সঙ্গে, পিসারোর সঙ্গে মনের পরিচয় হয়েছিলো আগেই। নিয়তি এভাবে মনের শিল্পীজীবনের শুরুতেই

তাঁর চারপাশে সেযুগের কতিপয় প্রতিভাদীপ্ত শিল্পী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। এরা সারা জীবন তাঁর সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী রূপে বিরাজ করেছিলেন। এই পর্যায়ে এক সময় তিনি পেলেন এদুয়ার মানেকে। মানে তখন সকল আলোচনার মধ্যমণি। তাঁর "ময়দানে পিকনিক" ও "অলিম্পিক" নিয়ে রক্ষণশীল মহলে যে নিন্দার ঝড় উঠেছিলো তা তরুণ প্রগতিশীল নিরীক্ষা-ধর্মী শিল্পীদেরকে মানের চারপাশে আরো সংহত করে তোলে। ১৮৬০-এর দশকের শেষ দিক নাগাদ এদুয়ার মানে বাতিইঁনল গোষ্ঠী নামে পরিচিত শিল্পী ও সাহিত্য সমালোচকদের অবিসংবাদিত নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত আড্ডায় মিলিত হতেন দেগা, ফঁতাঁ-লাত্যুর, দুরঁতি, জোলা, রেনোয়া, সিসলে, বাজিল, মনে এবং আরো কেউ কেউ। মনের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী মানে অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ মনোযোগী হন। মানের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণায় মনেও নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন।

তাঁর প্রজন্মের অধিকাংশ শিল্পীর মতো মনেও জীবনের বহুমুখী রূপ চিত্রিত করতে উৎসাহী হন নি। সমকালীন তীব্র সামাজিক কোন সমস্যাও তাঁকে তেমন আলোড়িত করে নি। তাঁর প্রথম দিকের চিত্রাবলীতে তিনি যেসব মানুষ এঁকেছেন তারা হয় নিজের পরিবারের আপন জন কিম্বা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব। ১৮৬৬-তে আঁকা "সবুজ পোশাক পরিহিতা রমণী"-তে আমরা দেখি তাঁর স্ত্রী কামিলকে। দু'বছর পরের "লাঞ্চ" ছবিতেও আমরা পাই তাকে, সঙ্গে ছেলে জঁ। ১৮৬৬-তে আঁকা "বাগানে মহিলারা" নামক আরেকটি ছবিতে আমরা দেখি শিল্পী বাজিল-এর বোনদের। ঘুরে-ফিরে আমরা শিল্পীর স্ত্রী, বন্ধু, বন্ধুর বোন ও স্বজনদেরই দেখি। এসব ছবি মনের দৃষ্টিভঙ্গির একটা দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরে। তিনি মানবিক সম্পর্কের জটিলতার ছবি আঁকতে চান নি, চরিত্রের অন্তর্জগতের রহস্যময়তা তাকে শিল্পী হিসাবে আকর্ষণ করে নি, বরং সহজ দৈনন্দিনতার মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্য ও কাব্যময়তা দেখেছেন তাকেই ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। মানুষ, তার পোশাক পরিচ্ছদ, পরিপার্শ্বের সঙ্গে তার দৃশ্যমান সম্পর্ক, এবং স্টুডিওর বাইরে আঁকা ছবি হলে মানুষের শরীর, মুখাবয়ব ও পোশাকের উপর আলোর খেলা—এই সকলই মনেকে আকর্ষণ করেছে। ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিক নাগাদই তিনি নিজের

স্বাভাবিক নৈপুণ্য ও প্রতিভা কোন দিকে তা উপলব্ধি করেন। এই সময় থেকেই তাঁর কাজে ফিগার কম্পোজিশান ক্রমান্বয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়তে শুরু করে। সে-জায়গায় শিল্পীর সব ক্ষমতা নিয়োজিত হতে থাকে ল্যান্ডস্কেপ অঙ্কনে।

তবে মনের প্রথম দিকের মানুষের ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে কাজে আসে। আমরা তাঁর নিসর্গ দৃশ্যে প্রায় সর্বদাই মানুষকে দেখি—মাঠে, সড়কের উপর, নৌকায় নদীবক্ষে কিম্বা বাগানে। মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্টের কথা মনে পড়ে আমাদের। অবশ্য আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে মনের ওই সব ল্যান্ডস্কেপ চিত্রে মানুষ প্রধান নয়। পরিবর্তনশীল জগতে মানুষ এক অপরিহার্য উপাদান, সামগ্রিক সুষমা বা সুসঙ্গতি তথা হার্মনিক স্বার্থেই সে উপস্থিত, কোন স্বয়ম্ভর দাবীতে নয়।

মনের ১৮৬০ আর ১৮৭০ দশকের ল্যান্ডস্কেপগুলি সম্পর্কে আরেকটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে। এগুলি তাঁর ফিগার পেন্টিং-এর চাইতেও অধিকতর মানবীয় মনে হয়। এর মূলে রয়েছে সম্ভবতঃ দুটি জিনিস। প্রথমতঃ নিসর্গ চিত্র আঁকার সময় তিনি সেই সব পরিবেশ বেছে নিয়েছেন যা মানুষের কাছাকাছি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যা জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, তিনি নিসর্গকে দেখেছেন সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে। আমরা তো আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষও হঠাৎ মাঝে মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের মধ্যে এমন কিছু দেখেন যা তাকে আলোড়িত করে, মুগ্ধ করে, আনন্দিত করে। ভোরে রাঙা সূর্যের এক ঝলক আলো, নদীর বুকে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মি, বাগানে ফুলের সমারোহ, বৃষ্টিভেজা গাছের পাতার সতেজ সবুজ রঙ, পুকুরে পদ্ম কিম্বা শাপলার চোখ জুড়ানো শোভা। অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী মনের চোখে এজাতীয় জিনিস ধরা পড়তো নিরন্তর।

মনের প্রথম দিকের ল্যান্ডস্কেপ চিত্রাবলীর মধ্যে আমরা শিল্পীর সামগ্রিক কর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই। তিনি নদী, সমুদ্রতীর, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদি আঁকতে ভালোবাসতেন। প্যারিসের নাগরিক দৃশ্যও তাঁর মনোযোগ এড়ায় নি। বাগান আর বৃক্ষশোভিত অরণ্য পথ তাঁকে আকর্ষণ করেছে বার বার। সামনে বাড়িঘর, দালান কোঠা, রাস্তা, আর পেছনে

খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারও পেছনে বিশাল তরু শ্রেণী। মোটিফ হিসাবে এসব নতুন নয়। কুরব্যে এধরনের অনেক ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তরুণ মনে ইতিমধ্যেই এ জাতীয় ছবিতেও তাঁর একটা স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে শুরু করেছিলেন।

প্রথম থেকেই মনের একমাত্র উপার্জনের উৎস ছিলো তাঁর ছবি। কাজেই দর্শকের সামনে ছবি উপস্থিত করার ব্যাপারটা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয়। কুরব্যে বা মানের মতো নিজস্ব উদ্যোগে একক প্রদর্শনী করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। ফলে সরকারী সালোর উপরই তাকে নির্ভর করতে হয়। ১৮৬৫-র সালোঁতে মনের দুটি ল্যান্ডস্কেপ গৃহীত হয়। ছবি দু'টি দর্শক-সমালোচক কর্তৃক মোটামুটি প্রশংসিতও হয়। ১৮৬৬-র সালোঁ-তে প্রদর্শিত শিল্পীর "সবুজ পোশাক পরিহিতা রমণী" বিশেষভাবে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অল্প কিছু দিন আগে সাহিত্যিক এমিল জোলা চিত্র সমালোচনার অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। তিনিও ছবিটির প্রশংসা করলেন। কিন্তু পরের বছর ভাগ্যদেবী মনের প্রতি অত সুপ্রসন্ন থাকলেন না। তাঁর জমা দেয়া অনেকগুলি ছবির মধ্যে মাত্র একটি জুরিবোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত হল। এতে শিল্পী ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন।

১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে মনে লন্ডনে যান। লন্ডনে তাঁর পরিচয় হয় চিত্রকলা জগতের ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব দ্যুরঁ-রুয়েল-এর সঙ্গে। পিসারের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। লন্ডন থেকে তিনি গেলেন হল্যান্ডে। বিলেতে কন্সটেবল ও টার্জারের ছবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় মনের শিল্পকলার উপর খানিকটা প্রভাব ফেলে, যদিও সে প্রভাবকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না। তবে বিলেত ও হল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে মুক্ত প্রকৃতির বুকে আলো বাতাসের খেলা, দিনের বিভিন্ন সময়ে রঙের বৈচিত্র্য, নদীর বুকে কুয়াশার জাল তরুণ মনের শিল্পী-চিত্তের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিলো। লন্ডনের কুয়াশাচ্ছন্ন ভেজা ভেজা পরিবেশ মনে যে কতো-খানি বিশ্বস্ততা ও স্পর্শকাতরতার সঙ্গে তাঁর ছবিতে তুলে এনেছেন সেটা ১৮৭১ সালে আঁকা তাঁর "টেমস নদী ও পার্লামেন্ট ভবনসমূহ" ছবিটি দেখলেই নির্ভুল ভাবে বোঝা যায়। পার্লামেন্ট ভবনের চূড়াগুলি আর ওয়েস্টমিনস্টার সেতু নীলচে-ধূসর কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে, নদীর

কিনারে কয়েকটি দালান কোঠার শুধু তীক্ষ্ণ রেখাভাস দৃশ্যমান, অস্পষ্ট পশ্চাৎ-প্রেক্ষাপট, ধূসর আকাশ, অস্বচ্ছ পানি—সব মিলে বৈপরীত্য আর মিলনের মধ্য দিয়ে একটি আকর্ষণীয় চিত্রল প্রভাব দর্শকের নয়ন-মনের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৭১-এর শেষ দিকে মনে বেলজিয়াম হয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। বিদেশ ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে নরম্যান্ডির গ্রামাঞ্চলের প্রাণোচ্ছল রূপরসগন্ধ তাঁর কাছে আগের চাইতেও মোহনীয় বলে মনে হল। নীনা কালিতিনা লিখেছেন— "It was with a kind of raptune that he immersed himself in it, giving himself up totally to the creative impuls, and the canvases he produced in this state ring out like a hymn to the Nature of this native land"[৫]

এই পর্যায়ে মনের আঁকা একটি ছবির কথা বলা দরকার। এজন্য নয় যে ছবিটি শিল্পীর সামগ্রিক কাজের মধ্যে ব্যতিক্রমী অসামান্যতা দাবী করতে পারে। এর তাৎপর্য অন্যদিক থেকে। ১৮৭২ সালে ল্য হাভর-এ মনে একটি ছবি আঁকেন, যার নাম দেন তিনি "ইম্প্রেশান, সূর্যোদয়।" জনৈক সাংবাদিক মনের এই ল্যান্ডস্কেপের অঙ্কনরীতিকে বিদ্রূপ করে "ইম্প্রশেনাজিম" কথাটি ব্যবহার করেন। অবশ্য আমরা জানি যে এর এক দশকেরও আগে মানের "ময়দানে পিকনিক" ছবিটির সময় থেকে এই অঙ্কনরীতি ও শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো। ১৮৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই মনে, পিসারো, রেনেয়া, দেনা প্রমুখ মানের নেতৃত্ব অনুসরণ করে এই ধারায় সমকালীন জীবন ও নিসর্গ দৃশ্য তাদের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে আরম্ভ করেন। বিশেষ করে ক্লোদ মনে ও কামিল পিসারো ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে কোনরকম আদর্শগত ব্যাখ্যা আরোপ না করে, কোনরকম গল্প বা নাটকীয় কাহিনী চিত্রায়নের কথা না ভেবে, শুধু তার দৃশ্যমান রূপ, তার উপর বিচিত্র বর্ণের বিভা, রঙের নিপুণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু মনের "ইম্প্রেশান, সানরাইজ" ছবিটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে যে এই ছবিটিই চিত্রকলার ইতিহাসের এক অসামান্য সমৃদ্ধ আন্দোলনের নাম যুগিয়ে দিল। প্রথম দিকে এই ইম্প্রেশানিজম শব্দটি ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গাত্মক অনুষঙ্গ নিয়ে। সংশ্লিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীও গোড়ায় নামটিকে সুনজরে

দেখেন নি, কিন্তু সেটা তাঁদের গায়ে স্থায়ী হয়ে লেপ্টে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত ইম্প্রেশানিস্টিক শিল্পী রূপে তাঁদের পরিচয় শুধু তাঁরা স্বীকার করেই নেন নি, সে-পরিচয়ে গৌরব ও গর্বও বোধ করতে শুরু করেন।

১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ইম্প্রেশানিস্ট চিত্র প্রদর্শনী। ত্রিশ জন শিল্পী তাঁদের সর্বমোট ১৬০টি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মনের ছবি ছিলো নয়টি, রেনোয়ার সাতটি, দেগার দশটি, আর পিসারো এবং সিসলের পাঁচটি করে।

এই প্রদর্শনীতে মনের নয়টি কাজের মধ্যে চারটি ছিলো পেস্টেলের। এরপর ১৮৭৬, ১৮৭৭ ও ১৮৭৯-তে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইম্প্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে মনে যথাক্রমে আঠারো, ত্রিশ ও উনত্রিশটি ছবি নিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রদর্শনীতে তিনি অংশ নেন নি, কিন্তু ১৮৮২ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম প্রদর্শনীতে আবার তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হলেন। এবার তাঁর উপহার পঁয়ত্রিশটি চিত্রকর্ম। এই সব প্রদর্শনীতে মনের ছবি ছিলো বোদ্ধা দর্শকদের জন্য বিশেষ আনন্দ ও ঔৎসুক্য জানানো আকর্ষণ। প্রথম প্রদর্শনীতেই স্থান পায় তাঁর "লাঞ্চ" ছবিটি, যা ১৯৬৮ সালোঁ জুরী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তা ছাড়াও ওই প্রদর্শনীতে ছিলো বুলভার দে কাপুসঁ্যা এবং ল্য হাভ্র্-এর সেই ঐতিহাসিক ল্যান্ডস্কেপ "ইম্প্রেশান, সানরাইজ"। শেষের দুটি ছবিতে শিল্পীর অঙ্কনশৈলীর পরিবর্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাঁর তুলির টান ইতিমধ্যে বৈচিত্র্য ও গতিময়তা অর্জন করেছে, শৈলী হয়ে উঠেছে অধিকতর প্রাণবন্ত, রঙ স্বচ্ছতর। ১৮৭২-এর পর থেকে বেশ কয়েক বছর মনে বাস করেন সেন নদী তীরবর্তী, প্যারিসের অনতিদূরে অবস্থিত, ছোট একটি শহরে। নাম আর্জেন্ত্যই। সেখানে অন্যান্য শিল্পীও এসে জমায়েত হতেন মনের সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। ইম্প্রেশানিজমের প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকাকে এইভাবেই যেন তারা স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। এদুয়ার মানেও সেখানে আসেন। ১৮৭৪ সালে এদুয়ার মানে আঁকেন তাঁর বিখ্যাত ছবি "নিজের স্টুডিও-বোটে ক্লোদ মনে," "নৌ-বিহার", "সেন নদী তীরে" এবং "আর্জেন্ত্যই"। সবার শ্রদ্ধাভাজন শিল্পী মানে রূপবাদী শিল্পীদের মধ্যে মনেকে স্বতন্ত্র করে দেখতেন। অঁতোন্যাঁ প্রুস্ত তাঁর স্মৃতিচারণায়

বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী মানে অনুজ মনে সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেন—"সমগ্র ব্রিশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ওই রকম ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে পারে এমন একজনও নেই। ও হচ্ছে জলের রাফায়েল। তার প্রতিটি গতি, তার পরিপূর্ণ গভীরতা, দিনের বিভিন্ন সময়ে তার নিরন্তর পরিবর্তিত রূপ, এই সবই সে অনুভব করে।"

১৮৭০-এর পুরো দশকে মনের চিত্রকর্মের মুখ্য বিষয় আঁর্জত্যই। আমরা দেখতে পাই সেন নদীকে, কখনো তার বুকে নৌকা চলছে, কখনো নৌকাবিহীন, আকাশ কখনো উজ্জ্বল সুনীল, কখনো শীতের মেঘের আড়ালে ধূসর। শহর-ও মনে ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যানভাসে, কখনো রৌদ্রস্নাত, কখনো বরফ ঢাকা। দিন ভালো থাকলে মনে আঁর্জত্যই-এর আশে পাশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেরুতেন। সঙ্গী হত স্ত্রী ও পুত্র। প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকার, নিষ্কলুষ বাতাস বুক ভরে টেনে নেবার আর গাছ পালা ফুল ফলের সমারোহ চোখ মেলে দেখার অনাবিল আনন্দ শিল্পী তাঁর এই সময়কার ছবিগুলিতে ধরে রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৮৭৩-এ আঁকা "দি পপীজ (এ প্রমেনাড")ছবিটির কথা। সতেজ মসৃণ ঘাসের কার্পেটের বুকে লাল ফুলগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে. মহিলারা হাঁটছেন শিশু সন্তানদের নিয়ে, উপরে প্রশস্ত আকাশ, তার বুকে ভাসছে সাদা লঘু মেঘপুঞ্জ। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে একটা প্রশান্তি, নির্মল আনন্দ, সহৃদয়তা। মনে প্রকৃতিকে এই ভাবেই দেখেছেন।

শিল্পকলার ইতিহাসে কোন কোন শিল্পী প্রকৃতির রুদ্র পরিবেশকেও তাঁদের চিত্রকর্মে অনবদ্য ভাবে রূপায়িত করেছেন, আমরা জানি। স্মরণ করুন ইংরেজ শিল্পী জোসেফ টার্নারের (১৭৭৫-১৮৫১) কথা, যার ছবিতে "we find readings of nature in its tenor and grandeur more often than in its peace and serenity."[৭] কিন্তু মনে ওই পথে অগ্রসর হন নি।

মনের আর্জ্যই পর্বের ছবিগুলিতে প্রকৃতির বিশাল বিস্তৃতি ও গভীরতা দর্শকের চিত্তে দোলা দেয়। সব চাইতে বেশী চোখে পড়ে ছোট ছোট জিনিস। প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা ও জীবনের চলময়তা সেখানে

সদা মূর্ত। বসন্তে ফুল ফুটছে, ফল পাকছে, তারপর কোমল ধূসর অবক্ষয়ের কাল, পাশ্চাত্যের শরৎ, আর তারপর শীত। কিন্তু মনের শীতের অর্থ মৃত্যু নয়, জীবনের অবলুপ্তি নয়। আমরা দেখি যে তখনো জীবন বয়ে চলেছে—সড়কের বুকে গাড়ি, মানুষ জন কর্মরত, বরফ ঢাকা বেড়ার গায়ে বসা একটি পাখি। সর্বোপরি, বিভিন্ন সময়ে বদলে যাওয়া প্রকৃতির পরিবর্তিত রূপ আমরা সর্বদা প্রত্যক্ষ করি তাঁর চিত্রকর্মে, তাঁর শীতের ছবিতেও। এই বরফ একটু গলছে, আবার নতুন করে তুষারপাত হচ্ছে, শুরু হচ্ছে শীতের নতুন দাপট।

১৮৭৩ সালে থিওদর দ্যুরের কাছে একটি চিঠিতে কামিলা পিসারো মনের শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেন তা শিল্পীর আঁর্জত্যই পর্বের সবগুলি ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। পিসারো লিখেছিলেন:

"I consider his talent very serious, very pure ; he is truthful, only he feels somehow differently ; but his art is thoroughly thought through ; it is based on observation and on a completely new feeling. It is poetry created by the harmony of true colours."[৮] পিসারো একথা বলেন ১৮৭৩ সালে। পরবর্তী সময়ে মনের ছবিতে শিল্পীর ওই ঈষৎ ভিন্ন ও নতুন অনুভূতি, সত্যিকার রঙের সুষমাময় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবিতার সৃষ্টি, আরো আকর্ষণীয়, আরো দ্যুতিময়, আরো মনোলোভা হয়ে ওঠে।

মনে মাঝে মাঝে আঁর্জত্যই ছেড়ে প্যারিসে যেতেন। ওই সময় তিনি দুটি চমৎকার ডেকোরেটিভ প্যানেল আঁকেন : মঁৎজরঁ-র বাগানের কোণ এবং মঁৎজর-র পুকুর। প্যারিসে এলে পর তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতো সেন নদীর দক্ষিণ তীরের Saint-Lazare রেলস্টেশনের নিকটবর্তী একটি অঞ্চল। ল্য হাভ্‌র্ থেকে ওই স্টেশনে পৌঁছে প্যারিসের উপকণ্ঠে ঘুরে বেড়াবার আগে তিনি তন্ময় হয়ে দেখতেন ধোঁয়া উদগীরণ করা রেলগাড়ী, রেল লাইনের বিচিত্র জাল, নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, একটার উপর দিয়ে আরেকটা, অদ্ভুত নক্সা তৈরী করে তারা শুয়ে আছে, উপর দিকে সেতু, স্টেশনের পাশের লোহার রেলিং দেয়া প্রাচীর, আর ইঞ্জিন থেকে উদ্গিত নীলচে-সাদা বাষ্প আর কালচে

ধোঁয়ার ঊর্ধ্বাকাশে উঠে নতুন এক রকম মেঘপুঞ্জ সৃষ্টি করার দৃশ্য। মনে এই সব নিয়ে একটার পর একটা ছবি আঁকলেন। সমকালীন নাগরিক জীবনকে তিনি এখানে ফুটিয়ে তুললেন তার প্রাণবন্ততা, চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা নিয়ে। এই ভাবেই সৃষ্টি হল শিল্পী মনের জীবনের প্রথম সিরিজ চিত্রাবলী—La Gave Saint-Lazare.

তৃতীয় ইম্প্রেশানিস্ট প্রদর্শনীতে মনের অংশগ্রহণের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিলো তাঁর Saint-Lazare স্টেশনের দৃশ্যাবলী ও মঁৎজর্ঁ-র ল্যান্ডস্কেপসমূহ। সাধারণ দর্শককুল গতানুগতিক রক্ষণশীল সমালোক-দের প্রভাবে এই সব ছবির প্রকৃত গুণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এই তৃতীয় প্রদর্শনীতেই রেনোয়া উপস্থিত করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি Dancing at the Monlin de la Galette এবং The Suring, আর পিসারো তাঁর Harvesting at Mortforce cault.

সত্তুরের দশক উত্তীর্ণ হবার আগেই মনের শিল্পকলার কয়েকটি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তুলির টান জেরোলো, প্রত্যয়ী, নিঃসংশয়। রঙ, বিশেষভাবে লালের নানা স্তর, প্রখর ব্যঞ্জনা নিয়ে ব্যবহৃত। রুদ্ধ স্টুডিওতে নয়, খোলা আকাশের নিচে, মাঠে কিম্বা নদী তীরে, কিম্বা নদীবক্ষের উপর নৌকা-স্টুডিওতে বসে, প্রকৃতির নিরন্তর পরিবর্তন-শীলতাকে তার চঞ্চল বর্ণবিভায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। একাজ করতে হলে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, সকাল দুপুর সন্ধ্যায়, যখন স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে তখন, আবার ঝোড়ো বাতাসে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে, দেখতে হবে কেমন করে সূর্যের আলো পড়ে পুকুরের পানি ঝিকমিক করছে. সকালে এক রকম, বিকালে আরেক রকম, মাঠ কেমন করে নতুন তুষারপাতে ছেয়ে যাচ্ছে, কেমন করে নদীর বুকে বসন্তের আগমনে টুংটাং শব্দ করে জমাট বাঁধা বরফ ভাঙছে, তারপর ভেসে যাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। একাগ্র চিত্তে, স্পর্শকাতর শিল্পীর হৃদয় নিয়ে, মনে এই সব দেখলেন এবং তাকে তুলে আনলেন তাঁর ক্যানভাসে, যা দেখে বিশ্ববাসী আনন্দে করিছে পান সুধা নিবরধি। কিন্তু মনের সমকালীন দর্শক সেদিন তাঁকে তার প্রাপ্য দেয় নি। অসুস্থ স্ত্রী এবং দুটি সন্তান নিয়ে নিদারুণ অর্থকষ্ট সহ্য করতে হয় তাঁকে। ১৮৭৫ সালে তিনি মানেকে লিখছেন, "দিন

দিন আমাদের অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে চলেছে। হাতে একটি পয়সা নেই। কসাই ও রুটিওয়ালার দোকান থেকেও আর ধারে কিছু পাওয়া যাবে না। আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটেই আস্থা হারাই নি, কিন্তু বর্তমান, বুঝতেই পারছেন, খুব কঠিন।" ১৮৭৭ সালে মনে আরেকটি চিঠিতে জোলাকে লিখছেন, "আমাকে একটা বড় ধরনের সাহায্য করতে পারবেন কি? করবেন কি? আগামী কাল, মঙ্গলবার, রাত্রির মধ্যে যদি আমি ৬০০ ফ্রঁ না দিতে পারি তবে আসবাবপত্র সহ আমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে দেয়া হবে এবং আমাদের দাঁড়াতে হবে একেবারে পথের উপর··· আমি একটা শেষ চেষ্টা করে দেখছি। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি আপনার কাছে আবেদন করছি যে আপনার পক্ষে হয়তো আমাকে ২০০ ফ্রঁ ধার দেয়া সম্ভব হবে। এই কিস্তিটা দিতে পারলে আমি হয়তো আরো কিছু দিনের সময় পাবো ···।" আমাদের মনে পড়ে বিদ্যাসাগরের কাছে লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের চিঠির কথা। মনের পক্ষে এজাতীয় চিঠি লেখা ছিলো ভয়ানক কষ্টকর। একমাত্র মানে এবং জোলা ছাড়া আর কারো কাছে তিনি এধরনের আবেদন কখনো করেনও নি। সব কষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছেন, একটা না একটা পথ খুঁজে বার করেছেনই নিজের চেষ্টায়, এবং যখন এত বিপর্যয়ের মধ্যেও রঙ তুলি ক্যানভাস নিয়ে একা, নিঃসঙ্গ বসেছেন প্রকৃতির মুখোমুখি, তখন চিত্তের কোথাও কোন খেদকে স্থান দেন নি, সমগ্র চিত্তকে আপ্লুত হতে দিয়েছেন অস্তিত্বের নির্মল আনন্দে।

১৮৭৮ সালে মনে সেন নদী তীরবর্তী ছোট শহর Vetheuil বসবাস করতে শুরু করেন। ফ্রান্সের সেন ও তার আশেপাশের অঞ্চল সারা জীবন মনের উপর প্রভাব ফেলেছে, তাঁর মানসগঠনে তর্কাতীত ভূমিকা রেখেছে। আমাদের মনে পড়ে ভল্গা আর ম্যক্সিম গোর্কি'র কথা। Vetheuil–এ তিনি বেশ কয়েকটি সুন্দর ছবি আঁকেন। এর পর তাঁর বাকী জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটে Giverney–তে। সেখানে তিনি বাস করতে শুরু করনে ১৮৮৩ সাল থেকে, যদিও গোটা ৮০-র দশক ধরেই তিনি আরো অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ান, জীবন তৃষ্ণা ও সৃজনশীলতার তাগিদে। তিনি Vernon-এর চারপাশে, Le

Havre–এ, Etreat-এ অনেকে কাজ করেন। ১৮৮৩-র শেষ দিকেই তিনি রেনোয়াকে নিয়ে রিভিয়েরাতে যান, তারপর l' Estaque-এ মনে দেখা করেন সেজানের সাথে।

নরম্যান্ডি, ব্রিটানি ও মেডিটেরানিয়ানের ল্যান্ডস্কেপ ছাড়াও মনের আশির দশকের চিত্রকর্মে বারবার যা ফিরে আসে তা হল Giverny-র মোটিফ এবং এই গিভার্নি-ভিত্তিক ছবিগুলির মধ্যেও খড়ের গাদার মোটিফকে আমরা দেখি একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। ১৮৮৬–তে আঁকেন "গিভার্নিতে খড়ের গাদা", '৮৮-তে "গিভার্নির প্রান্তর", তাছাড়াও আমরা পাই আরেকটি ছবি, "গিভার্নির কাছে খড়ের গাদা।" এর কয়েক বছর পর শিল্পী আরো বড়ো একটি সিরিজ আঁকেন, যা "Haystacks" নামে সুপরিচিত। তবে সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে মনের বর্তমান পর্বের কাজ সম্পর্কে আরো দু'একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে।

"গিভার্নিতে খড়ের গাদা" (১৮৮৬) ছবিটি এখন আছে লেনিন-গ্রাদের বিশ্ব বিখ্যাত মিউজিয়াম হার্মিটেজে। "গিভার্নির প্রান্তর"ও (১৮৮৮) রয়েছে ওই একই যাদুঘরে। এই খড়ের গাদা, মাঠ, পেছনে গাছ, কুটির, আর আকাশের বিস্তার—সব মিলে কম্পোজিশানের সারল্য এবং তার সাথে রঙের উচ্ছল স্বচ্ছতা ছবিগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মনে প্রকৃতির মধ্যে যে প্রশান্তি অনুভব করেছেন তাকে ধরে রেখেছেন এই চিত্রাবলীতে। কম্পোজিশান এবং মোটিফের দিক থেকে একটা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত থাকলেও এই ছবিগুলিকে সাধারণতঃ সিরিজ ছবি বলে বিবেচনা করা হয় না। প্রকৃত "খড়ের গাদা" সিরিজ ছবি মনে আঁকেন ১৮৯০-এর দশকে, এবং সেখানে আমরা পাই বেশ কিছু নতুন জিনিস।

উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মনে সিরিজ ছবি অঙ্কন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইউরোপীয় চিত্রকলার অঙ্গনে সিরিজ ছবি আগেও হয়েছে। ঋতুচক্র, সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনী, বছরের বিভিন্ন সময়ে পল্লী জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শিল্পীরা সিরিজ ছবি এঁকেছেন, কিন্তু মনের মতো শুধু খড়ের গাদা, কিম্বা পপলার গাছের সারি কিম্বা কোনো ক্যাথিড্রালের ফাসাদ-কে একটা মোটিফ করে তাঁর আগে কেউ সিরিজ ছবি আঁকেন নি।

এই ধারায় মনের পূর্বসূরী হলেন জাপানী চিত্রশিল্পীরা, বিশেষভাবে কাতাসুশিকা হোকুসাই, বিখ্যাত "ফুজি পর্বতের ৩৬টি ভিউ" সহ যিনি বহু সিরিজ-চিত্র সৃষ্টি করেছেন।

মনে তাঁর সিরিজ ছবিগুলিতে মূল বিষয় অপরিবর্তিত রেখেছেন, কিন্তু বদলে দিয়েছেন, প্রধানতঃ, তার উপর আলোর খেলা। ফলে দ্রষ্টার চোখ একই বিষয়কে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর যখন বিষয়টি সম্পর্কে তার ঔৎসুক্যে ভাঁটা পড়ে তখন তার দৃষ্টি পড়ে অন্য জিনিসের উপর। সে লক্ষ্য করে যে এক এক ছবিতে আলো পড়েছে এক এক রকম ভাবে, ছবির বিভিন্ন অংশ এক সময় ছায়াছন্ন, অন্য সময় আলো উদ্ভাসিত, কখনো ঘন ও সংহত আবার কখনো লঘু ও স্বচ্ছ। তাই এসব ছবিতে আলো-ই হয়ে ওঠে "নায়ক"[৮]। গিভানির পল্লী অঞ্চলে হেঁটে বেড়াবার সময় খড়ের গাদাগুলি মনেকে আকর্ষণ করে, কয়েকটি ছবিও তিনি আঁকেন ওই বিষয় নিয়ে। পরে ১৮৯০ সালে তিনি "Haystacks" নামে পরিকল্পিতভাবে একটি সিরিজ আঁকতে শুরু করেন। ১৮৯১-এর মধ্যে তিনি এই রকম পনেরটি ছবি এঁকে ফেলেন। কোথাও ঝলমলে আকাশের নিচে খড়ের গাদা, কোথাও আকাশ কালো মেঘে ছাওয়া, কোথাও মাঠ যেন সবুজ কার্পেট, কোথাও ধূসর-ছাই রঙা, আর খড়ের গাদাগুলি লাল, হলুদ কিম্বা লাইলাক রঙে উদ্ভাসিত, বিচিত্র বর্ণচ্ছটার বহুমাত্রিক স্তরে দেদীপ্যমান। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক আনাতোলি লুনাচারস্কি লিখেছেন যে ক্লোদ মনে একের পর এক অজস্র খড়ের গাদার ছবি এঁকেছেন, সকালে, দুপুরে; সন্ধ্যায়, চন্দ্রালোকে, বৃষ্টিতে। মনের এই অনুশীলন রঙের ব্যবহার পদ্ধতিতে একটি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি। "তার বদলে এগুলি হয়ে উঠেছে ছোট ছোট কবিতা। খড়ের গাদাগুলি কখনো রাজকীয় গর্বে ভূষিত, কখনো ভাবালু ও বিষণ্ন, কখনো শোকার্ত।"[৯]

১৮৯০-এ "খড়ের গাদা" সিরিজের পাশাপাশি মনে "পপলার" সিরিজটিও শুরু করেন। ১৮৯১ সালে দুঁরেঁহ রুয়েল গ্যালারিতে খড়ের গাদা সিরিজ প্রদর্শিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। পরের বছর তিনি প্রদর্শন করেন তাঁর পপলার তরুশ্রেণীর সিরিজটি। ওই বছরই, অর্থাৎ ১৮৯২

সালে, তিনি শুরু করেন তাঁর আরেকটি অত্যন্ত সফল সিরিজ চিত্রকর্ম। মনে এর নাম দেন "রুয়েঁ ক্যাথিড্রাল" সিরিজ। বছর তিনেক জুড়ে, তিনি এই ছবিগুলি আঁকেন। ১৮৯৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন এগুলি আবার প্রদর্শিত হল তখন শিল্পীর যৌবনের বন্ধু ও সহকর্মীরা তাঁকে অভিনন্দন জানালো, যদিও সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত চিত্তে নয়। তাঁর পুত্রের কাছে এক চিঠিতে পিসারো লিখলেন, "ক্যাথিড্রাল ছবিগুলি অনেকেই সমালোচনা করেছেন, কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে দেগা, রেনোয়া ও আমি তার প্রশংসা করেছি। ... আমি এর মধ্যে এমন একটা গৌরবোজ্জ্বল ঐক্য লক্ষ্য করেছি যা আমার নিজের অন্বিষ্ট।"[১০]

রুয়েঁর ক্যাথিড্রালটি শিল্প। মনেকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিলো। বিভিন্ন কোণ থেকে, বিভিন্ন অবস্থান থেকে, এবং দিনের বিভিন্ন সময়ে গীর্জাটির গভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ আবেদন মনে অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। দীর্ঘ দিন ধরে, প্রায় একটা ঘোরের মধ্যে, তিনি এই কাজগুলি করেন। ১৮৯২ সালে মনে স্ত্রীর কাছে একটি চিঠিতে লেখেন যে সারা রাত তাঁর কেটেছে দুঃস্বপ্ন দেখে, তাঁর মনে হচ্ছিলো গীর্জাটা যেন তাঁর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ছে, কখনো সেটা দেখাচ্ছিলো নীল, কখনো গোলাপী, কখনো হলুদ বর্ণ। ১৮৯৩ সালে মনে লেখেন যে তিনি উন্মাদের মতো এঁকে চলেছেন। প্যারিসের Music d'Orsay-তে এই সিরিজের (মোট বিশটি ছবি এঁকেছিলেন মনে) পাঁচটি ছবি আছে ঃ মেঘলা আবহাওয়ায় ক্যাথিড্রাল, ভোর বেলায় ক্যাথিড্রাল (হার্মানি ইন হোয়াইট), প্রভাতের সূর্যালোকে ক্যাথিড্রাল (হার্মানি ইন ব্লু), পরিপূর্ণ সূর্যালোকে ক্যাথিড্রাল (হার্মনি ইন ব্লু এ্যান্ড গোল্ড), এবং দিনের কোন সময়ে অঙ্কিত হয়েছে তার উল্লেখহীন ক্যাথিড্রালের ছবিটি, তাকে অনেকেই অভিহিত করেন হার্মানি ইন ব্রাউন বলে। মস্কোস্থ ললিত-কলার পুস্কিন মিউজিয়ামে আছে এই সিরিজের দুটি ছবি : দুপুরে রুয়েঁ ক্যাথিড্রাল এবং সন্ধ্যায় রুয়েঁ ক্যাথিড্রাল। এই সব ছবিতে রঙের কাজ মন ভরিয়ে তোলে। সন্ধ্যার ছবিটিতে উর্ধ্বাকাশের গাঢ় সুনীল রঙ, নিচে কালচে-নীল ও বেগুনি ছায়ার প্রলেপ, মধ্যবর্তী স্থানে সোনালী, গোলাপী ও হাল্কা লাইলাক রঙের মাঝে মাঝে ফিকে নীলের লঘু ছিটে ফোঁটা—এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে মনে রুয়েঁ ক্যাথিড্রালের ফাসাদটির

যে বৈকালিক রূপ তুলে ধরেছেন তার কাব্যময়তা ও বিশ্বস্ততা সেদিন বহু শিল্পরসিককে মুগ্ধ করেছিলো, আজও করে। সেদিনের প্রখ্যাত প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ক্লে মেনশ' রাজনীতির অঙ্গন থেকে ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে রুয়ে ক্যাথিড্রাল সিরিজের একটি উষ্ণ প্রশস্তিমূলক রচনা প্রকাশ করেন "জাস্টিস" পত্রিকায়। অবশ্য তখনো মনের বিরোধী গোষ্ঠী চুপ করে থাকে নি। তাদের একজন মনের এই পর্বের সব ছবিকে আখ্যায়িত করেছিলেন "রাবিশ" বলে।

মনে, স্পর্শকাতর একজন সাধারণ মানুষের মতোই, যুক্তিহীন বিরূপ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হতেন, প্রশংসায় খুশী হয়ে উঠতেন, কিন্তু নিন্দা-প্রশংসা কোনটিই তাঁকে তাঁর শিল্পবিশ্বাস ও নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয় নি। নতুন শতকের প্রথম দশকে তিনি আবার লন্ডনের কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন "ওয়াটার্লু সেতু" এবং "গাংচিল"। দুটি ছবিতেই শিল্পী যেভাবে টেমস নদীর উপরে ঝুলে থাকা কুয়াশা চিত্রিত করেছেন তাতে সেতু এবং নদী তীরের ভবনগুলি একটা অবাস্তব ও ভুতুড়ে দৃশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের মনে পড়ে প্রায় ত্রিশ বছর আগে শিল্পীর আঁকা লন্ডনের দৃশ্যাবলীর কথা। কত আলাদা, অথচ কি নির্ভুল ঐক্যসূত্রে গ্রথিত।

মনের জীবনের শেষ দিকের সিরিজ চিত্রের মধ্যে "ওয়াটার-লিলিজ"-ই সম্ভবতঃ সবচাইতে বিখ্যাত ও প্রশংসিত। জীবনের শেষ ত্রিশ বছরের অধিকাংশ সময় মনে কাটাতেন তাঁর গিভার্নির বাগানে ও পরিপার্শ্ব অঞ্চলে। এখানে তিনি পুকুর ও পুকুরের বুকে ওয়াটার-লিলির অনেক-গুলি ছবি আঁকেন। ক্রমাগত অনুশীলন ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে শিল্পী একটা নতুন উপলব্ধিতে উপনীত হন। আলোর সদাচঞ্চল নিরন্তর পরিবর্তন তাঁকে সর্বদাই আলোড়িত করতো। এবার জলের উপর এই আলোর প্রভাব তাঁকে মুগ্ধ করলো। জলের উপরিস্তরে আলো ঝিলমিল করছে, আলো তীরের মতো জলের গভীরে প্রবেশ করছে, আলো চঞ্চলভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে জলের উপর, আর এই সঙ্গে জলে ছায়া পড়েছে আকাশ আর ঝুঁকে পড়া তীরের গাছগাছালির। সর্বোপরি রয়েছে গোলাপী ও সাদারঙের ওয়াটার লিলি, যার আলঙ্কারিক ও রূপময় দিকটি

মনে সচেতনভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন। এই ছবিগুলি দর্শককে হয়তো প্রথমে ঈষৎ বিভ্রান্ত করে। তিনি ঠিক কি দেখছেন তা ভালো করে বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে সঠিক প্রেক্ষিতটি খুঁজে পাবার প্রশ্ন রয়েছে। একবার সে প্রেক্ষিতটি পেলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। জনৈক শিল্প-সমালোচকের ভাষায় "By focusing all his creative powers on the transference to the canvas of his experience of light, he (Monet) allowed others to see afresh the everchanging richness of the narural world."[১১]

বয়স বাড়তে থাকলেও মনের শিল্পতৃষ্ণায় ভাঁটা পড়ে নি। দীর্ঘ জীবন লাভের ফলে তিনি ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের প্রায় সকল শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের সমসাময়িক হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ সালে তিনি "ওয়াটার লিলি" ডেকোরেটিভ প্যানেলগুলি আঁকতে শুরু করেন। ১৯২১-এর গোড়ার দিকে দ্যুরঁ-রুয়েলের গ্যালারিতে তাঁর একটি রেট্রো-স্পেকটিভ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নতুন কালের অনেক শিল্পী মনেকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বেশ কয়েকজন তাঁর শিষ্য হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মনে সর্বদা কোনরকম পরামর্শদান বা সুপারিশ করা থেকে নিজেকে কঠোরভাবে বিরত রাখতেন। ১৯২০ সালে এক সাংবা-দিককে তিনি যা বলেছিলেন তা থেকে চিত্রকলা শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেন, "তাদের (চিত্রকলার শিক্ষার্থীদের) ছবি আঁকতে পরামর্শ দিও, যেমন তারা পারে, যতো বেশী করে তারা পারে, দুর্বল ফলাফল সম্পর্কে ভীত না হয়ে। তাদের চিত্রাঙ্কন যদি নিজের ভেতর থেকেই উন্নততর হয়ে না ওঠে, তা হলে কিছুই করবার নেই... আমি কিছুই বদলাতে পারবো না।" এর পর মনে যোগ করেছিলেন, "আঙ্গিক বদলায়, কিন্তু শিল্প একই থাকে। সেটা হল প্রকৃতির মুক্ত এবং আবেগজাত ভাষ্য।"[১২]

১৯২২ সালে শিল্পীর চোখের রোগ দেখা দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি "ওয়াটার লিলি"-র আলঙ্কারিক প্যানেলগুলি আঁকতে থাকেন। ১৯২৩ সালেও তিনি ওই কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। অবশেষে, দীর্ঘ সফল জীবন যাপনান্তে, ছিয়াশি বছর বয়সে, ১৯২৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তাঁর প্রিয় বাসস্থান গিভার্নিতে ক্লোদ মনে মৃত্যুবরণ করেন।

বিশ্ব চিত্রকলার ইতিহাসে ক্লোদ মনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সমকালীন শিল্পীরা যে নতুন ধ্যানধারণার প্রবক্তা ছিলো মনে ছিলেন তার মুখপাত্র, নতুনদের দিশারী ও নেতা। তিনি কখনো তত্ত্ব প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না। পাখি যেমন করে গান গায় সেই ভাবে তিনি ছবি এঁকেছেন, স্বতঃ উৎসারিত অন্তর-তাগিদে। কিন্তু তাঁর প্রবল প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি সঠিক ভাবে যুগের দাবী অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সাধারণ দর্শক ও চিত্রকলার সহজ অনুরাগী হিসাবে মনের চিত্রকর্ম সম্পর্কে আমাদের হয়তো রুশ সমালোচক ও পণ্ডিত টুগেন্ডহোল্ডের একটি মন্তব্যই সব চাইতে গ্রহণযোগ্য ও আলোকসঞ্চারী বলে মনে হবে। টুগেন্ডহোল্ড বলেছেন, "মনের শিল্পকলা সূর্য, বাতাস, সমুদ্র, সবুজ গাছ-গাছালিকে মহিমামণ্ডিত করেছে...রঙের সানন্দ কলধ্বনিতে তা ভরপুর...এখনো তা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল আবেগসমূহ জাগিয়ে তোলে।"[১৩]

তথ্য-নির্দেশ

১ "ক্লোদ মনে", অরোরা আর্ট পাবলিশার্স; লেনিনগ্রাদ, ১৯৮৪; ১৯৮৬, নীনা কালিতিনার ভূমিকা, পৃ ২৬

২ প্রাগুক্ত, পৃ ৫

৩ "গ্রেট মাস্টার্স অব ফ্রেঞ্চ ইমপ্রেশানিজম", ক্রাউন পাবলিশার্স ইনকরপোরেটেড; নিউ ইয়র্ক, ডায়ানা কেলডারের ভাষ্য, পৃ ৫০

৪ প্রাগুক্ত, নীনা কালিতিনার ভূমিকা থেকে, পৃ ২৬

৫ প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৬ নীনা কালিতিনা কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪

৭ "আর্ট থ্রু দি এজেস", হেলেন গার্ডনার, হর্স ডিলা ক্রয় ও রিচার্ড ডি ট্যানসে কর্তৃক পরিমার্জিত, ৭ম সংস্করণ, হারকোর্ট ব্রেস জোভানো-ভিচ কর্তৃক প্রকাশিত, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০, পৃ ৭৪৯

৮ প্রাগুক্ত; নীনা কালিতিনার ভূমিকা, পৃ ২১

৯ "আর্টিকলস অন আর্ট", লুনাচারস্কি, মস্কো, ১৯৪১, পৃ ৪০৫

১০ "পুত্র লুসিয়েঁর কাছে পত্রাবলী" কা. পিসারো, প্যারিস, ১৯৫০, পৃ ৩৮১-৮২, প্রাগুক্ত, নীনা কালিতিনার ভূমিকায় উদ্ধৃত, পৃ. ২১-২২

১১ "ইম্প্রেশানিজম", বেলিন্ডা টমসন এবং মাইকেল হাওয়ার্ড, এক্‌জিটার বুকস, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, পৃ ১২৫

১২ নীনা কালিতিনা কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, "ক্লোদ মনে" গ্রন্থ, পৃ ২৬

১৩ "দি আর্টিস্টিক কালচার অব দি ওয়েস্ট", টুগেন্ডহোল্ড, মস্কো, ১৯২৮, পৃ ৯৬